উড়ালগদ্য-৩

কাজী জহিরুল ইসলাম

মার্গারেটের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে

তখন ফেব্রুয়ারী মাস। ২০০১ সাল। শাদা বরফের নিচে ডুবে আছে কসোভো। আমার অস্থিরতা ক্রমশই বাড়ছে। এভাবে আর চলতে পারে না। লিখছি কিন্তু সাহিত্যের কোন আড্ডা হচ্ছে না, লেখাগুলো কারো সাথে শেয়ার করতে পারছি না, কোনো বই বেরুচ্ছে না। কেবলি মনে হচ্ছে সেজে-গুজে বসে আছি কিন্তু দেখার কোন লোক নেই। রূপ-যৌবন হলো প্রদর্শনের জিনিস, দেখাতে না পারলে এই রূপ-যৌবন থেকে কি লাভ। এই অবস্থা আর কিছুদিন চলতে থাকলে আত্মহত্যাও করে ফেলতে পারি। দম বন্ধ হয়ে আসা এই অস্থির প্রবাস যন্ত্রণা থেকে বের হয়ে আসার ক্ষুদ্র একটা জানালা আবিস্কার করলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, কসোভোতে অবস্থানরত স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক লেখক-কবিদের নিয়ে একটা আড্ডা গড়ে তুলবো। আমার ডাকে সাড়া দিলেন জাতিসংঘ-কসোভো মিশনের স্টাফ রিক্রিয়েশন কমিটির দায়িত্বে নিয়োজিত দীর্ঘাঙ্গিনী অস্ট্রিয়ান তরুণী বারবারা। কমিটি হয়ে গেলো, বারবারার জোরাজুরিতে সভাপতিও হলাম। পোয়েটস ফোরামের প্রথম সভা হবে বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ছয়টায়। দূর-দূরান্ত থেকে কবিদের চিঠি, ইমেইল আসতে শুরু করলো। কেউ কেউ অতি উৎসাহী হয়ে আগাম কবিতাও পাঠিয়ে দিলেন। শুভ্র ডানা দুলিয়ে তুষারের পরীরা উড়ে বেড়াচ্ছে কসোভোর আকাশে, ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালিয়ে আমরা বসেছি কবিতার আড্ডায়। আফগানিস্তানের কবি বশির সাখাওয়ার্জ চমৎকার গান করেন। তিনি আমাদেরকে ফার্সি এবং হিন্দি ভাষায় গান শোনালেন। ভারতের কবি রমা ভট্টাচার্য শোনালেন ইংরেজী কবিতা। অন্যান্য কবিদের আর কারো নামই এখন আর আমার মনে নেই। তবে এটা স্পষ্ট মনে আছে দক্ষিন আফ্রিকার এক শ্বেতবর্ণের কবি অসাধারণ একটি দীর্ঘ কবিতা শুনিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া এ আড্ডায় অংশ নিয়েছিলেন তিনজন আলবেনিয়ান ভাষার মহিলা কবি, একজন ব্রিটিশ কবি, একজন জার্মান কবি এবং একজন রাশিয়ান কবি যাদের নাম মনে করতে পারছি না বলে ভীষণ অস্বস্তি লাগছে।

পরদিন সকালে বারবারা টেলিফোন করে জানালো, তোমাকে একজন পাগলের মতো খুঁজছে। আমি বললাম, কে সে? বারবারা জানালো তার নাম মার্গারেট, একজন আইরিশ কবি। বারবারার ফোন রেখে মাত্র সোজা হয়ে বসেছি অমনি আইরিশ কবি মার্গারেটের টেলিফোন। তিনি আমাকে লাঞ্চ-এ দাওয়াত করতে চান। একজন কবির আমন্ত্রণ, তা-ও আবার মহিলা কবি, না করার দুঃসাহস নেই আমার। তবে তাকে জানালাম, আজ না, পরের উইকে। রোববারটা কোনোরকমে পেরিয়েছে। সোমবার সকালে অফিসে

ঢুকতেই মার্গারেটের ফোন। মনে আছেতো, আজ দুপুরে লাঞ্চের দাওয়াত? ঠিক ১২টা পনেরোতে চলে আসবে, টেরান্সে, আমি অপেক্ষা করবো।

একটি রেড ওয়াইনের বোতল সামনে নিয়ে বসে আছে মার্গারেট। বয়স পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হবে। তবে মেদহীন ঝরঝরে শরীর, মাথাভর্তি ঝাকড়া চুল। স্ট্র-কালারের ফিনফিনে পাতলা শিফনের স্কার্ট আর ওপরে একটা শাদা শার্ট পরেছেন ভদ্রমহিলা। ওভারকোটটা রেস্টুরেন্টের কোর্ট হ্যাঙ্গারে রাখতে রাখতে বললেন, তুমি রেড ওয়াইন পছন্দ করোতো? মার্গারেটের দুই হাতের দশ আঙুলে দশটি আংটি এবং গলায় একটি এবনি কাঠের কুচকুচে কালো মসৃণ এবং তেলতেলে মালা দেখে বুঝলাম এই মহিলার মাথায় গন্ডগোল আছে। প্রশ্ন করার আগেই সে গরগর করে নিজের পরিচয় দিতে শুরু করলো। মূলত আমি একজন স্কাল্পচারিস্ট। পাথর কেটে কেটে শেইপ বের করি। পাথর কাটতে কাটতে একসময় মনে হলো এবার শব্দ নিয়ে খেলবো। তখন থেকেই কবিতা লিখছি। আর তুমি? ইন্ডিয়ান? আমি বেশ গর্বের সাথে উচ্চারণ করলাম, না বাংলাদেশী। লক্ষ্য করলাম, বাংলাদেশ কথাটি শোনার সাথে সাথে তার চোখ চকচক করে উঠলো। উপচে পড়া উৎসাহ তার বাংলাদেশ সম্পর্কে, বাংলাদেশের মানুষ, প্রকৃতি, কবিতা সম্পর্কে। লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে মার্গারেট তার প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে দুটি কবিতা পড়ে শোনালো। আমি তেমন কিছুই বুঝলাম না, শুধু বুঝলাম কৈশোরের কোনো এক আনন্দময় ঘটনার কথা বলতে চেয়েছে কবিতায়। বেশ কিছু ফুলের কথা এসেছে, এক কিশোর বন্ধুর কথা এসেছে। এবার আমার পালা। পোয়েটস ফোরামের জন্য তিন/চারটা কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করেছিলাম। ওগুলো পড়ে শোনালাম। একটি কবিতা ছিলো, বেনিয়ান ফল। এটা সম্পর্কে ও বেশ আগ্রহ দেখালো।

ও আমাকে অনুরোধ করলো আমি যেন কবিতাটি আমার মাতৃভাষায় আবৃত্তি করে শোনাই। কবিতার একটি লাইন ছিলো, 'আমি ডাহুকের কান্না শুনি রোজ রাতে' এইখানে এসে আটকে গেলাম। ও জানতে চাইলো ডাহুক কি? আমি বললাম, ডাহুক একটা পাখি, বাংলাদেশী পাখি। এই পাখি জলাশয়ের আশ-পাশের অরণ্যে, ঝোপ-ঝাড়ে থাকে। স্ত্রী ডাহুক ডিমে তা দিতে দিতে এক পর্যায়ে গলা ছেড়ে ডাকতে থাকে। একদিন ডাকতে ডাকতে ওর গলা দিয়ে রক্ত বের হয় আর তখনি ডিম ফুটে ডাহুকের বাচ্চা বেরিয়ে আসে। জনশ্রুতি আছে, যতক্ষণ ডাহুকের গলা দিয়ে রক্ত না আসে, ততক্ষণ ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় না।

তাকিয়ে দেখি মার্গারেটের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।